



রূমানা মঞ্জুর প্রসঙ্গ কিছু কালোসিধে কথা বলতে চাই

কাবেরী গায়েন

ভেবেছিলাম লিখবো না, কারণ লিখে যে খুব কিছু হয় সবসময় এমন দাবি করা যাচ্ছে না, এবং শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের প্রভাষক ফাহিমদা বা গণযোগাযোগ বিভাগের মেধাবী ছাত্রী সুতপা'র মৃত্যুকে কেন্দ্র করে লেখালেখি থেকে একটি বিষয় স্পষ্ট হয়েছে এ'সব লেখালেখি করে নিজে খানিকটা সান্ত্বনা পাওয়া যায় যে ছিলাম আমিও প্রতিবাদে, এর বাইরে খুব যে কাজ হয় তেমন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। তবুও আজ লিখছি বা বলা ভালো যে না লিখে পারছি না এই অস্তর্গত তাড়না থেকে যে সত্যিই যখন আজ রূমানা দেশে ফিরেছেন তার ডান চোখের আলো ফিরে পাবার শেষ আশাস্টুকু ছাড়াই তখন ওই যে আমিও ছিলাম প্রতিবাদে কেবল সেই গৌঁয়ার সান্ত্বনাটুকুর জন্যই হয়তো এই লেখা। ভেতরে কোথায় যেন একটা শুভবোধ কাজ করছিলো যে অস্ত এক চোখের আলো তার ফিরে আসবে। সেই শুভবোধের, আশার ক্ষীণ আলোটি যখন শেষ হয়ে গেলো, তখন আমি সত্যিই কিছু কালোসিধে কথা বলতে চাই।

যে অন্তত এবং আপোষ কেড়ে নিয়েছে চোখের আলো

কথা খুব সহজ। রূমানা মঞ্জুর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক বিভাগের সহকারি অধ্যাপক। কানাডার ব্রিটিশ কলাবিহার ইউনিভার্সিটিতে গবেষণারত। তার শিক্ষার্থীদের বয়ানে জানা যায় তিনি একজন জোরালো শিক্ষক। তার পারিবারিক অবস্থানও অত্যন্ত জোরালো, বাবা অবসরপ্রাপ্ত সামরিক কর্মকর্তা। স্বামী সুনৰ্ণন এবং বুয়েট থেকে পড়াশুনা করা। সহকারী দাবি করেছেন তার অমায়িক আচরণের কথা। কানাডা থেকে তার প্রতিবেশীরা একত্রিত হয়ে একটি লিখিত বক্তব্য পাঠ করেছেন তার স্বামী'র শাস্তি দাবি করে এবং সেখানে তারা উল্লেখ করেছেন রূমানাকে তাদের

আড়ায়-আসরে খুব বেশি পাওয়া যেত না কারণ তিনি ক্যাম্পাস থেকে ফিরে প্রতিদিন ফোন করতেন তার মেয়ের এবং স্বামীর সাথে কথা বলার জন্য। এভাবে শিক্ষিত স্বাবলম্বী শক্তিশালী অবস্থানের সংসারমুখী রূমানা মঞ্জুর সমাজের প্রতিষ্ঠিত ভালো মেয়ের এবং আদর্শ স্ত্রী'র সব তরিকা পূরণ করেছেন। কিন্তু তবুও তাকে স্বামীর হাতে নির্যাতিত বলে নির্যাতিত, একেবারে দু'টো চোখই খুইয়ে বসতে হয়েছে। তার নাক কামড়ে ছিঁড়ে নিয়েছে সেই স্বামী, যাকে তিনি একদিন ভালোবেসে বিয়ে করেছিলেন। প্রায় সব পত্রিকার আরো যে খবরটি এসেছে তা হলো তিনি গত দশ বছর ধরেই কম-বেশি নির্যাতন সহ্য করে এসেছেন। এমনকি এবার আসার পরও নাকি তার বেকার স্বামী, যিনি তার বাবার বাড়িতেই থাকেন, তাকে তিনি দিন একটি ঘরে আটকে রেখেছেন। সবশেষে বিবিসিকে দেওয়া সাক্ষাত্কারে (২০ জুন, ২০১১) রূমানা মঞ্জুরের বাবা বলেছেন মেয়ের জীবন এবং তার পরিবারের জীবনের নিরাপত্তা নিয়ে তারা শংকিত।

সংবাদ সম্মেলনে রূমানা

স্বাভাবিকভাবেই দেশবাসীর সহানুভূতি রূমানার সাথে। আমি একই বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন সহকারী হিসাবে ঘটনার শুরু থেকেই বেদনা এবং ক্ষুঁক্তির কোন তল পাচ্ছি না। একই অবস্থা প্রায় সবার। সবাই এই ঘটনার দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাইছেন। আমিও চাই, এমন দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি তাকে দেওয়া হোক যেনো ভবিষ্যতে কেউ এমন করার আগে সম্ভাব্য শাস্তির ভয়াবহতা মনে করে হলেও উদ্যত হাত নামিয়ে ফেলে। এ'কথা সত্য এ'জাতীয় ঘটনা বাংলাদেশের অনেক ঘরেই ঘটে কিন্তু এই ঘটনাটি এতো আলোড়ন তুলেছে এ'কারণেই যে প্রায় অবিশ্বাস্য রকমের নিখুঁত অবস্থারের একজন নারীও কতখানি অসহায় হয়ে উঠতে পারেন মুহূর্তে এবং তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ এমন একজন নারী কীভাবে দশবছর ধরে এই নির্যাতনকারীর সাথে ঘর করেছেন প্রশং উঠছে সে বিষয়েও। এই 'কীভাবে'র উত্তরটি খুঁজতে যাবার আগে আরো একটি প্রয়োজনীয় তথ্য উল্লেখ করে রাখতে চাই। রূমানা নির্যাতিত হবার সাতদিন পরে ঘটনাটি গণমাধ্যমে আসতে পেরেছে বা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অফিসিয়ালি অবগত হয়েছে। জানা যায়, পরিবার থেকেই বিষয়টি চেপে রাখার একটি ব্যাপার ছিলো।

ঘটনার অন্যদিকে, খবরটি গণমাধ্যমে আসার অনেক পরে আসামী গ্রেফতার হয়েছেন, সব মিলিয়ে তিনি প্রায় দশদিনের মত সময় পেয়েছেন নিজেকে গুচ্ছে নেবার। প্রধানমন্ত্রী নির্দেশ দেবার আগ পর্যন্ত পুলিশ তাকে ধরতে পারেনি অথচ প্রধানমন্ত্রী নির্দেশ দেবার ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই পুলিশ গ্রেফতার করতে পেরেছে। কারণ সম্ভবত নির্যাতক হাসান সাইদ জনেক মন্ত্রীর ভাই। তার এই সামাজিক পরিচিতিটি গুরুত্বপূর্ণ এ'কারণে যে এই অবস্থানের কারণে তিনি পালিয়ে থাকতে পেরেছেন অথচ গণমাধ্যমে তার বেকারত্ব থেকে শুরু করে নানা ধরনের অসহায় অবস্থানের বিষয়টি তুলে ধরে তার

আচরণের প্রতি একধরনের সহানুভূতি আদায়ের চেষ্টাও করেছেন। দিতীয়ত, গ্রেফতার হবার পর সাইদ হাসান প্রথমেই চেষ্টা করেছেন নিকৃষ্টতম পদ্ধতি দিয়ে শুরু করতে; আর তা হলো রুমানার সাথে এক ইরানি তরঙ্গের ‘অবেধ’ প্রেমের গল্প ফাঁদা, যা আমাদের সামাজিক বাস্তবতায় প্রায় অব্যর্থ মহৌষধের কাজ করে। ফলে রাতারাতি আরেকটি পক্ষ দাঁড়িয়ে গেলো যারা সাইদের অসহায় দৃষ্টিশক্তিহীন কর্মক্ষেত্রে অসফল এবং প্রতারিত স্বামীর ইমেজের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে উঠলেন। যদিও পরে তিনি স্থীকার করেছেন এটি বানানো, তার স্ত্রীর এমন কোন সম্পর্ক নেই। মোটামুটি এই কাঠামোর ভেতর থেকে, পারিবারিক সহিংসতার এই ঘটনা থেকে কয়েকটি প্রবণতা বের করে আনতে চাই। এই প্রবণতাগুলো বের করে আনতে যে চলকগুলো ব্যবহার করা হবে তা হলো, নির্যাতক, নির্যাতিত, সমাজ এবং রাজনীতি।

নির্যাতক সাইদ এবং পুরুষত্ব

শুরু করছি সাইদের ঘটনা থেকে। প্রথমত, সাইদ বুয়েটের পড়ালেখা শেষ না করা, বার বার ব্যবসায় ব্যর্থ, প্রায় দৃষ্টি প্রতিবন্ধী, অসফল এবং হতাশ এক পুরুষ, যে নিজের অক্ষমতার জ্বালা মেটাতে চেয়েছে, তার বক্তব্য অনুযায়ী, রুমানাকে খুন করে। এই একটিমাত্র ক্ষেত্রে সে সাফল্যের পরিচয় দিতে পেরেছে। প্রাণে মেরে ফেলতে না পারলেও কামড়ে রুমানার নাক ছুলে নিয়ে এবং চোখ উপড়ে ফেলে সে একবার তার ‘পুরুষত্বের’ জ্ঞান দিতে পেরেছে। অর্থাৎ একজন সব অর্থে অসফল পুরুষ, সব অর্থে একজন সফল নারীকে (সাইদকে জীবনসঙ্গী নির্বাচনের মত অসফল কাজটি করা ছাড়া) নিজের কজায় রাখার জন্য মেরে ফেলতে চেয়েছে। এই চাওয়ার বৈধতা হলো তার স্বামীত্ব। স্বামীত্ব হলো সেই প্রভৃতি যা দিয়ে স্ত্রীকে মেরে ফেলার চিন্তা পর্যন্ত করা চলে এবং সেই চিন্তা ও কাজের পক্ষে সাফাই গাওয়ার চেষ্টা করা সম্ভব।

এই ভয়াবহ অপরাধটি সংঘটিত করে সাইদ কিন্তু অনুতপ্ত হননি বরং দিতীয় অপরাধটি করার প্রস্তুতি নিয়েছেন। তার স্ত্রী’র চরিত্রে কালি দিতে চেয়েছেন কল্পিত প্রেমিকের গল্প ফেঁদে। অর্থাৎ শারীরিকভাবে প্রায় খুন হয়ে যাওয়া যেয়েটিকে তিনি তখন সামাজিকভাবে খুন করতে চেয়েছেন। নিজের অপরাধকে লয় করার জন্য স্ত্রীকে খুন করতে এবং তার চরিত্র কল্পিত করতে তিনি এতটুকু বিচলিতবোধ করেননি। এখানেও তার স্বামীত্ব তার অহম-কে ত্পু করতে ব্যবহৃত হয়েছে। এই কাজটি তিনি করতে পেরেছেন কারণ প্রতারিত স্বামীত্বের ইমেজ তৈরি করতে পারলে স্ত্রী’র বিরুদ্ধে যে-কোন অন্যায়কে আমাদের সমাজ এখনো বৈধতা দেয়, আইন না দিলেও। যেমন ‘প্রতিত’ প্রমাণ করতে পারলে যে-কোন ধর্ষণ বা খুনের মামলা থেকে সামাজিকভাবে মুক্তি পাওয়া যায়। ইয়াসমিন হত্যা বা জেলের কাস্টডিতে থাকার সময় পুলিশের দ্বারা প্রথমে ধর্ষিত ও পরে খুন হয়ে যাওয়া সীমার ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি কীভাবে তাদের পতিতা বানানোর চেষ্টা করা

হয়েছিলো। যেন একজন পতিতাকে খুন করা জায়েজ। সাইদ সেই চেষ্টা এখনো চালিয়ে যাচ্ছেন। (মানবজিমিন, ২১ জুন ২০১১)।

নির্যাতিত রুমানা এবং তার পরিবার

রুমানার দুই চোখের আলো নিভে গেছে। ক্ষতবিক্ষত নাক এবং মুখমণ্ডল নিয়ে তিনি ধুকছেন হাসপাতালে। রুমানার প্রতি সহানুভূতি ও শুভকামনার সাথে সাথে একটি প্রশ্ন জোরালো হয়ে উঠেছে, কেন তিনি এতো দিন ধরে এই নির্যাতন সহ্য করেছেন? তার পর্যায়ের এক নারীর তো এমন সম্পর্ক টিকিয়ে রাখার কথা না। ধর্ম এবং আইন-দুই-ই বৈধতা দিয়েছে অসহনীয় বিবাহিত সম্পর্ক ছিঁড়ে ফেলার। যেহেতু এই প্রশ্ন করার অবস্থায় রুমানা নেই তাই ধারণা করে নিতে হচ্ছে, হয়তো সম্পর্কটি টিকিয়ে রাখার ভালোমানুষী চেষ্টা যা ভালোবাসা থেকেই উৎসারিত বা সন্তানের মুখ চেয়ে থেকে যাওয়া বা সামাজিক দৃশ্য-অদৃশ্য চাপের কাছে নতি-স্থীকার। হয়তো সবগুলোই সত্য। শেষ অনুমিতিটিই প্রবল হয়ে ওঠে যখন দেখা যায় নির্যাতনের সাতদিন পর্যন্ত এই ঘটনাটি অস্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিচার্স লাউঙ্গের মুখ্য আলোচনার বিষয় হলেও অফিসিয়াল সেটা পরিবার থেকে জানানো হয়নি। না বিশ্ববিদ্যালয়কে, না গণমাধ্যমকে। আমরা এখনো জানিনা, সাইদের পক্ষ থেকে কী ধরণের চাপ ছিলো। যদি ধরেও নেই সাইদের পক্ষ থেকে প্রবল কোন চাপ ছিলো, তা বলে হত্যাচেষ্টার পুলিশ-কেস করা হবে না সাতদিন পর্যন্ত, এ কেমন কথা? তা’হলে কি পরিবার তখন পর্যন্ত ঘটনাটি চেপেই রাখতে চাইছিলো? নির্যাতিত রুমানা এবং তার পরিবারও পুরুষতাত্ত্বিক নিপীড়ন-কাঠামোকে টিকিয়ে রাখছেন।

সামাজিক অনুভব কাঠামো

আপাতদৃষ্টিতে রুমানাকে এইমতো সম্পর্কের রেশ এতো দীর্ঘদিন বয়ে নেবার জন্য দায়ী করাই যায়, কিন্তু একটু শোঁজ নিলে হয়তো দেখা যাবে তার সন্তানের নিরাপত্তা এবং পিতৃপরিবারের সম্মানের কথা ভেবে তিনি সরে যেতে পারেননি। পরিবারও তাকে উৎসাহিত করতে পারেনি সামাজিক লোকলজ্জার ভয়ে। সুতপার ক্ষেত্রেও দেখেছিলাম তার মৃত্যুর পর তার ভাইবেরো বলেছেন সুতপাকে তার স্বামী প্রায়ই মারধোর করত। তখনও আমার প্রশ্ন ছিলো যে আদরের বোনকে হারিয়ে তারা পাগল-প্রায়, সেই বোনের দিনের পর দিন নির্যাতনের কাহিনী শুনেও তারা কেন বোনকে ওই বিয়ে থেকে সরিয়ে আনেন নি। সুতপার ক্ষেত্রে পরিবারকেই দায়ী করতে হয় কারণ সুতপা তখনও ছাত্রী, অর্থনৈতিক সম্মতা অর্জন করেন নি। রুমানার ক্ষেত্রে তো তা নয়, কিন্তু সত্য হলো রুমানা সরে আসতে পারেন নি। আমরা যে সামাজিক অনুভব কাঠামোর মধ্যে বসবাস করি সেখানে দৃশ্য-অদৃশ্য এতো চাপ থাকে যা অতিক্রম করার জন্য তথাকথিত ‘ভালো মেয়ে’ বা ‘ভালো স্ত্রী’র ইমেজটিকে পরিত্যাগ করার মত মানসিক দৃঢ়তা না থাকলে এই

নিপীড়নের সাথেই বসবাস করতে হয়। আমাদের ক্রপকথা থেকে শুরু করে কাবে, সাহিত্যে, পুঁথি-পাঁচালিতে, প্রবাদে, পুরাণে, ধর্মে, ইতিহাসে, উপন্যাসে, গানে, নাটকে, চলচিত্রে ভালো নারীত্বের যে ‘গুণী অথচ দুর্বল’ এবং পুরুষের প্রতি নির্ভরশীল, যা পিতা-পুরুষ থেকে স্বামী-পুরুষে হস্তান্তরের প্রক্রিয়ামাত্র, তকমাটা এটে দেওয়া হয়েছে, রুমানার হয়ে উঠেছেন সেই ভালো নারীত্বের প্রতিনিধিত্বকারী অসহায় শিকার। আর তাই তিনি যখন আক্রান্ত তখনও দেখি একদল পত্রিকা চায় তাকে পৃথিবীতে অসম্ভবপ্রায় নিষ্কলুষ চরিত্রের (যেমন তিনি মনুভাষী, পাঁচবেলা নামাজ পড়েন, মাথায় কাপড় দিয়ে কানাডার প্রতিবেশীদের সাথে দেখা করেন, কানাডার প্রতিবেশীরা তাকে চেনেন তার মিষ্টি ব্যবহার এবং ভালো রান্নার জন্য ইত্যাদি) করে উপস্থাপন করতে, আরেকদল পত্রিকা চায় তার কথিত প্রেমের কাহিনী চাউর করে সাইদের অপরাধের ভার লাঘব করতে। দুই ক্ষেত্রেই রুমানার প্রতি কতটা সহানুভূতি থাকবে তা নির্ধারণ করার চেষ্টা করা হয় তথাকথিত ভালোমেয়ের সার্টিফিকেট সাপেক্ষে। এবং সাইদ নাক থেতলে, চোখ তুলে না নেওয়া পর্যন্ত রুমানার এই বিয়ে-সম্পর্ক থেকে বেরিয়ে আসার বৈধতা তৈরি হয় না।

তা'হলে প্রশ্নটা হলো, যদি সত্যিই রুমানার অন্য কোন পুরুষের সাথে নতুন করে সম্পর্ক গড়ে উঠতো, তা'হলেও সাইদ এই অত্যাচারের অধিকারী কি না বা রুমানার উপর চালানো এই ভয়াবহ অত্যাচারের প্রতিবাদে আমরা দাঁড়াবো কি না। প্রথম প্রশ্নের উত্তর হলো, না। সাইদ বড়জোর বিয়ে-বিচ্ছেদের নোটিশ দেবার অধিকারী। দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর হলো, অবশ্যই। একজন নির্যাতিত মানুষের পাশে সমর্থন নিয়ে দাঁড়ানোর জন্য তার চারিপ্রিক সনদ হাতে রাখার প্রয়োজন পড়ে না। কিন্তু সামাজিক অনুভব কাঠামোতে এই সত্যটিকে নিয়ে আসার জন্য সচেতন মেয়েদের যেমন এগিয়ে আসতে হবে তেমনি সচেতন রাজনৈতিক প্রতিরোধের প্রয়োজন রয়েছে।

কেন এটিও রাজনৈতিক লড়াই

কেন কোন মেয়ে নির্যাতিত হয়েও বিবাহিত সম্পর্কে টিকে থাকতে চায় বা মেয়েকে নির্যাতিত জেনেও তার পরিবার সেই সংসারটি টিকিয়ে রাখতেই মদদ দেয়? এই লৈঙ্গিক সংস্কৃতিটি বুঝতে হবে রাজনৈতিক অর্থশাস্ত্রীয় সম্পর্কের সাপেক্ষে। স্বামীর বাড়ি থেকে বের হয়ে আসা মানে তার আর নিজের কোন জায়গা না থাকা। নারী বঞ্চিত তার উত্তরাধিকার সম্পত্তি থেকে। মেয়েটির পরিবারে ফিরে আসা মানে ভাইয়ের সম্পত্তিতে অংশভাক হওয়া। বাবার বা ভাইয়ের পরিবার মেয়ে-জামাই-নাতি এলে তাকে মুরগী জবাই করে খাওয়াতে আগ্রহী কিন্তু মেয়েকে সেই সম্পত্তির অংশ দিতে আগ্রহী নয় পিতা বা ভাই নামের পুরুষত্ব। আগ্রহী নয় তার এবং তার সন্তানের দেখভাল করার দায়িত্ব নিতে। অথচ মেয়েকে গুণী হিসাবে তৈরি করলেও তাকে আত্মনিরশীল করে গড়ে তোলেনি পরিবার এবং সমাজ। বিয়ের সময় খুব বড় শিক্ষিত

পরিবারেও বলতে শুনেছি, ‘আমার মেয়ে শুধু কলেজে যায় আর বাসায় আসে। আমরাই সাথে করে নিয়ে যাই আবার নিয়ে আসি। ও পথ-ঘাটও চেনে না।’ কাজেই স্বামীর সংসার থেকে ফিরে আসা মানে স্নেহময় পিতা কিংবা ভাইয়ের উপর নির্ভরশীলতা। বিয়ে দেবার মধ্য দিয়ে পিতৃপরিবার এই দায় থেকে এক ধরনের মুক্তি নিয়ে নেয়, ফলে নতুন করে সেই দায় নিতে রাজী থাকে না। দ্বিতীয়ত, সন্তানের অভিভাবকত্ত। বাংলাদেশে বিয়ে, বিয়েবিচ্ছেদ, সন্তানের অভিভাবকত্ত এবং সম্পদে অধিকারের মত বিষয়গুলো চলে পারিবারিক আইনের কাঠামোতে। নারীর অধিকার কেবল সন্তানের জন্মাদান এবং লালন-পালনে, নারী তার সন্তানের বৈধ অভিভাবক নয়, অভিভাবক সন্তানের পিতা। সেদিক থেকেও নারী অসুবিধাজনক অবস্থানে রয়েছে। সন্তানের মুখ চেয়েও তাই নারীকে নিপীড়ক স্বামীর সংসার করে যেতে হয়। কাজেই রাষ্ট্র যতদিন এই বৈষম্যমূলক আইনগুলো পরিবর্তন না করবে বা রাষ্ট্রকে বাধ্য না করানো যাবে, যা আসলে ব্যাপক রাজনৈতিক সংক্ষার, ততোদিন পর্যন্ত ধর্মের নামে, সমাজের নামে, লোকলজ্জার নামে নারীর বিরুদ্ধে এই সহিংসতা থেকে মুক্তি আশা করা দুঃসাধ্য। একটি নিরাপদ রাষ্ট্র যেখানে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবাই নিরাপদ, যেখানে লিমনও নিরাপদ, নারী সাংসদ কবরীও নিরাপদ, সেই রাষ্ট্রে তো সন্তানের নিরাপত্তার জন্য রুমানাদের কাবো উপর নির্ভর করতে হবে না। পুরুষের উপর নারীর এই নির্ভরশীলতার অস্তর্গত রাজনীতি থেকে রাষ্ট্রকে মুক্ত করতে হলে যে পাল্টা রাজনীতি প্রয়োজন, সেই রাজনীতিতে সামিল হওয়া চাই।

যে ‘ভালো মেয়ে’র সনদ কিনতে হয় নিজের সন্তাকে বিসর্জন দিয়ে, নিজের অঙ্গহানি নয়তো জীবন দিয়ে, মেয়েদের সময় এসেছে পুরুষত্বের চাপিয়ে দেওয়া এসব ভালো মেয়ের যেরাটোপ থেকে বেরিয়ে মানুষ হিসাবে নিজের দাবি নিয়ে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হবার। যেকোন দামে বিয়ে টিকিয়ে রাখার বিপরীতে নারীর বিয়ে-নিরপেক্ষ মানবিক অবস্থানটি প্রতিষ্ঠার কোন বিকল্প নেই। অস্তত নিজের চোখ দু'টি তো রক্ষা করতে পারা চাই, নয়তো কীসের জীবন? তবে সমাজের প্রচলিত অনুভব কাঠামো এবং রাজনীতির বিপরীতে দাঁড়ানো খুব সুখের হবে না, হয়নি কখনো তবু মানুষের চলার বেগেই পারের তলায় রাস্তা জাগে। আবেদন-নিবেদনের উন্নয়ন মডেল থেকে বের হয়ে জীবনের দায়িত্ব মেবার রাজনীতিটি বুঝে নেবার এইটাই মাহেন্দ্রক্ষণ। যে-সামষ্টিক অন্ধত্ব এবং আপোষ রুমানার চোখের আলো কেড়ে নিয়েছে, তার বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর কোন বিকল্প নেই।

ড. কাবেরী গায়েন: সহযোগী অধ্যাপক, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।